অবহেলিত ও বিস্মৃত নায়ক

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কমল মুখার্জী

ভূমিকা

বাংলার দুই মহান সন্তান, কৃতী সন্তান, একজনের নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, অপরজন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই ভদ্র বংশজাত, দেশহিতৈষী, রাজনীতিবিদ, নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করে গেছেন, কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে। একজনকে ষড়যন্ত্র করে সূদুর কাশ্মীরে হত্যা করা হয়েছিল আর একজনকে তো নিরুদ্দেশই করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি জীবিত না মৃত, মৃত হলেও কবে সেটা সংঘটিত হয়েছিল কেউ জানে না। এত প্রচার সত্ত্বেও নেতাজী প্রত্যেকটি ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছেন কিন্তু শ্যামাপ্রসাদজী, তাঁকে লোকে ভুলতে বসেছে। আজকের জনগণ অনেকে তাঁর নামই জানে না, কি তাঁর অবদান তাইই জানে না, সেই দুঃখে ও বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে এই ক্ষুদ্র লেখার উদ্দেশ্য। জনগণের কাছে শ্যামাপ্রসাদজীর পরিচিতি, জনগণের হৃদয়ে তাঁর স্থান করে দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সহজবোধ্য এই লেখা। যদি জনসাধারণ তাঁর অবদানের কথা মনে রাখে বা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দেয় তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি কেউ আঘাত বা ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন আমার ভাবাবেগের কথা স্মরণ করে তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তারিখ - ২১/১০/২০১৪ কমল মুখার্জী

চুঁচুড়া
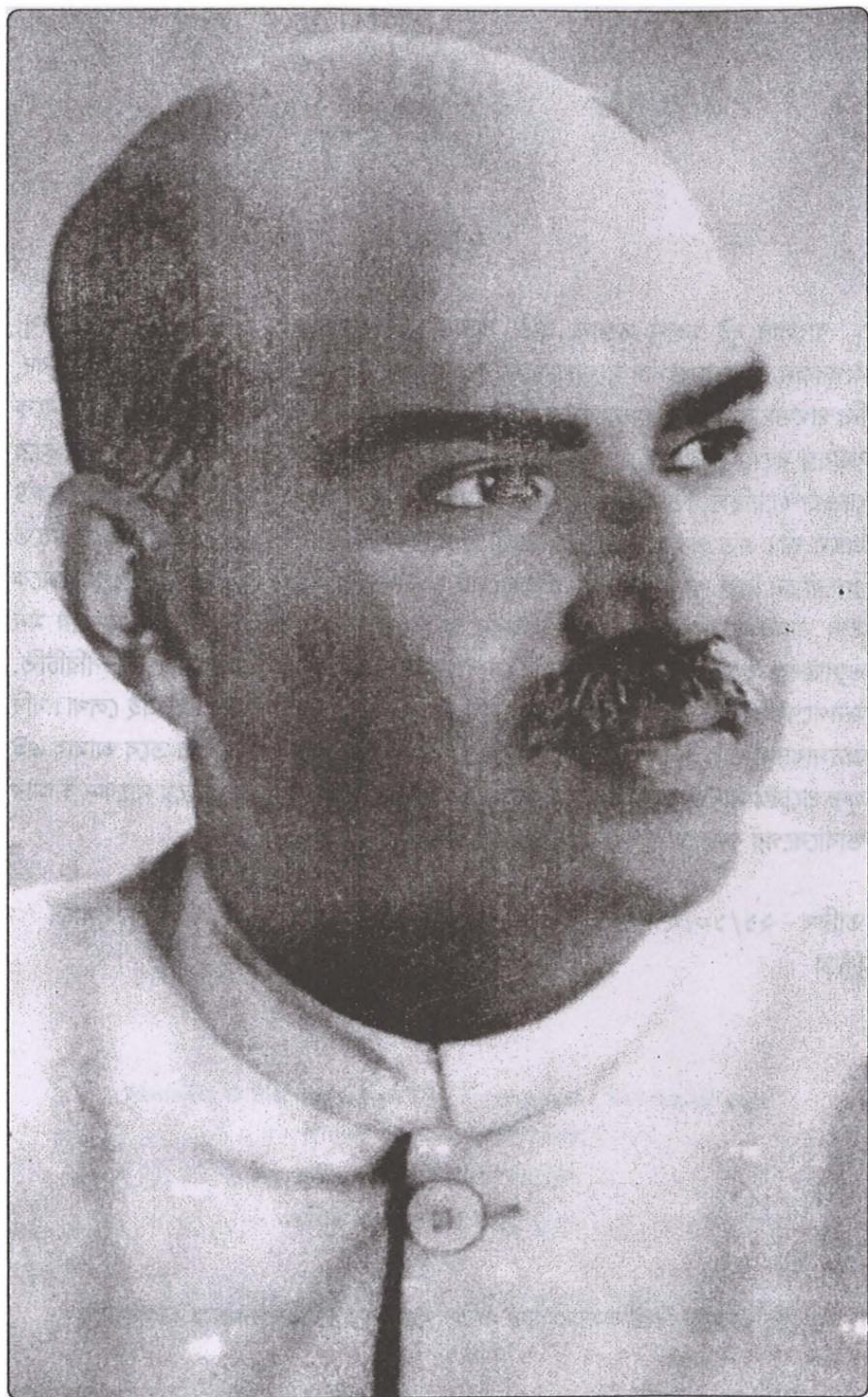
আজকের দিনে শ্যামাপ্রসাদজী (ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) বিশেষ করে পঃ বঙ্গে একটি বিস্মৃত নাম। অনেক ব্যক্তি, যুবক তাঁর অবদান তো দূরের কথা তাঁর নামই জানে না। কিন্তু পঃ বঙ্গবাসী হিন্দুরা এবং পাঞ্জাবের শিখ হিন্দুরা তাঁর কাছে অশেষ ঋণী। সুতরাং তাঁকে ভুলে যাওয়াটা পাপ বা অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলে মনে করি।

শ্যামাপ্রসাদজীর জন্মশতবার্ষিকীতে কলিকাতার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনন্ত কুমার, স্বর্গীয় তপন সিকদার, মমতা ব্যানার্জী, প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মতাদর্শ কারণে উক্ত অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন উনি বিদ্বান হলেও মহান নন এবং ওনার বিযাক্ত মতবাদ থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। কি সেই বিষাক্ত মতবাদ। উনি নাকি হিন্দুদের নেতা, মুসলিম বিরোধী তথা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। অথচ এই শ্যামাপ্রসাদজী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্দ্ধে উঠে বিদ্রোহী করি নজরুল ইসলামকে অসুস্থতার সময় সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করেন নি যাহা মুজফফর আহমেদ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন, কবিও অন্তর থেকে ওনাকে শ্রদ্ধা করতেন যদিও তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। (শ্যামাপ্রসাদকে লেখা কবি নজরুলের চিঠি শেষে লিপিবদ্ধ ভরা আছে)

আজকে পঃবঙ্গ রাজ্য পাওয়ার ফলেই আমরা ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা ব্যানার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পেয়েছি, না হলে ওনাদের স্থান রাজনীতিতে কোথায় থাকত বলা মুস্কিল ছিল। এবং পঃ বঙ্গে হিন্দুদের অবস্থা কী হত ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। অথচ কি নিষ্ঠুর পরিহাস এই শ্যামাপ্রসাদজীই বেশীরভাগ জনগণের কাছে সাম্প্রদায়িক, তাঁর নামই জানে না।

শ্যামাপ্রসাদজী সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি একজন কৃতী ছাত্র, স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সুযোগ্য পুত্র। পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক। আদি নিবাস হুগলী জেলার জিরাট গ্রামে। অবশ্য তাঁরও আগে ওনাদের পিতৃভূমি ছিল হুগলী জেলার দিগসুই গ্রাম। ওখানে ১৭৮৭ সালে ১৮ই অক্টোবর গঙ্গাপ্রসাদের বাবা বিশ্বনাথের জন্ম। যেহেতু তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন হন, তাই বিধবা জননী শিশু পুত্রটিকে সঙ্গে করে

বাপের বাড়ীতে চলে আসতে বাধ্য হন। মাতুলালয়ে অতি কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করায় খুব একটা শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। পরে তিনি জিরাটেই নিজস্ব বসতবাটী নির্মাণ করেন। গঙ্গাপ্রসাদ ছয় বৎসর বয়সে মাতৃহারা ও তের বছর বয়সে পিতৃহারা হন অর্থাৎ বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র সতের বছর। তিনি খুব 'কষ্টে সৃষ্টে' ভাইদের মানুষ করেন এবং পিতা বিশ্বনাথের সমস্ত ঋণ শোধ করেন। জিরাটে ১৮৩৬ সালে ১৭ই ডিসেম্বর গঙ্গাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাপ্রসাদ তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং মালাঙ্গা লেনের এক বাসায় থাকতেন। এখানেই কাঁসারীপাড়া নিবাসী হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জগৎতারিণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৬১ সালে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এবং ১৮৬৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মিষ্টভাষী, পরহিতৈষী, তাঁকে দেখলেই ভক্তি হত। হিন্দু কুসংস্কারগুলির উপর গঙ্গাপ্রসাদের কিছু মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি ধীর ও প্রবলচিত্তের লোক ছিলেন, কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। ধর্ম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা, কর্তব্যজ্ঞানে কঠোর আবার অত্যন্ত সদয়। পরবর্ত্তীকালে যখন ডাক্তারী পেশা শুরু করলেন তখন রসা রোডে (অধুনা আশুতোষ মুখার্জী রোড) নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ করেন।

গঙ্গাপ্রসাদের প্রথম সন্তান আশুতোষের জন্ম ১৮৬৪ সালে ২৮শে জুন মালাঙ্গা লেনের বাসাবাড়ীতে। আশুতোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ১৯০১ সালের ৬ই জুলাই ভবানীপুরের বাড়ীতে ৭৭ নং রসা রোডে যাহা পরবর্তীকালে সারা ভারতে আইন শিক্ষা ও রাজনীতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। মাতা ছিলেন যোগমায়া দেবী।

শ্যামাপ্রসাদ ১৯০৬ সালে মিত্র ইন্সটিটিউশন (ভবানীপুরে) ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে বৃত্তি সহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় প্রথমস্থান নিয়ে পাশ করেন। ১৯২১ সালে বি.এ-তে সাম্মানিক ইংরাজীসহ শীর্ষস্থান লাভ করেন। উপরোক্ত দুই পরীক্ষাতেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শীর্ষ স্থান দখল করে রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। মাত্র তিন বছর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা সমূহের এম.এ পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে এম. এ পড়ানোর ব্যবস্থা করেন এজন্য শিক্ষিত সমাজের একাংশ সন্তুষ্ট হন নাই এবং তাঁর এই ব্যাপারে সমালোচনা শুরু করেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। কিন্তু একরোখা 'বাংলার বাঘ' তাঁদের সমালোচনার জবাবে এবং বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদকে বাংলায় এম.এ ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন যদিও শ্যামাপ্রসাদ ইংলিশে অনার্সে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী। বলাবাহুল্য এই পরীক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ শীর্ষস্থান অধিকার করেন। সালটা ছিল ১৯২৩ সাল। সেই পরীক্ষায় দুই পেপারের পরিবর্তে যে থিসিস তথা মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন তা ছিল "The Social Plays of Girish Chandra".

ইতিমধ্যে এম. এ পড়ার সময় ১৯২২ সালে ১৬ই এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদের বিবাহ সংঘটিত হয়। পাত্রী ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী ডাঃ বেনীমাধব চক্রবর্তীর কন্যা-সুধা দেবী।

ছাত্রাবস্থাতেই পিতা আশুতোষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, কার্য্যপদ্ধতি ও বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর প্রতিভা যাহাতে সর্বমুখী হয় সেজন্য পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল সেজন্য তিনি পুত্রকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। ১৯২৪ সালে এম.এ. ডিগ্রী পাবার আগেই তিনি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা কমিটির সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন, ঐ বছর তিনি ল'ও (Law) পাশ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে স্যার আশুতোষের প্রথম কন্যা রাণী যাঁকে আশুতোষ 'আমার রাণীমা' বলে সম্বোধন করতেন তাঁর ১৯০৪ সালে নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। পাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শুভেন্দু সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভাগ্য যে ১৯০৫ সালে মাত্র একবছর বাদে তিনি বিধবা হন। জেদী আশুতোষ এই মেয়ের পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এবার পাত্র ছিলেন আইনজ্ঞ যোগীন্দ্রলাল কাঞ্জিলালের ভাইপো ব্রজেন্দ্রনাথ। সালটা ছিল ১৯০৮। দুর্ভাগ্য ১৯০৯ সালে তিনি আবার বিধবা হন। সেই দিদিই ছিলেন তাঁদের গৃহকর্ত্রী। মাতৃস্থানীয় এই দিদিও মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯২৩ সালে ৫ই জানুয়ারী মাত্র পাঁচ দিনের অসুখে মারা যান। পুত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আগেই দিদির মৃত্যুর এক বছর পরেই ১৯২৪ সালে ২৫ শে মে শ্যামাপ্রসাদের পিতৃ বিয়োগ হয়। পাটনা শহরে হঠাৎই তিনি মারা যান। এই ঘটনা শ্যামাপ্রসাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এসেছিল। তখন থেকেই তাঁর জীবনের গতির পরিবর্তন হয়ে গেল। জীবনের নূতন অধ্যায় শুরু হল।

আর একটা কথা বলা হয়নি। ১৯১২ সালে স্যার আশুতোষ মধুপুরে নূতন বাড়ী নির্মাণ করেন তখন শ্যামাপ্রাসাদের বয়স এগার বৎসর।

ঐ বছর অর্থাৎ ১৯২৪ সাল থেকেই তিনি আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে ব্যরিস্টারী পড়তে যান এবং ১৯২৯ সালে ব্যরিস্টারী পাশ করে আসেন। বিলাতি থেকে ফিরে এসে তিনি আইন ব্যবসা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম অধ্যাপনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস সদস্যরূপে পরিষদীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ সালে কংগ্রেস কাউন্সিল বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং পরে স্বতন্ত্র সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। আগেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট তথা সিন্ডিকেটের সদস্য রূপে নির্বচিত হয়েছিলেন। এই পোষ্টে থেকে তিনি বাবার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ সময় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডঃ উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী তাঁর কাজের ভূয়সী

প্রশংসা করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাংলা বিভাগে বিশেষ অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করাতে বিশেষ উৎসাহ দেখান এবং রবীন্দ্রনাথকে 'কমলা লেকচারার' বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্য যেন শ্যামাপ্রসাদের পিছু ছাড়ছে না। হঠাৎ ১৯৩৩ সালে স্ত্রী সুধাদেবী মারা যান। তখন তাঁর চারটি নাবালক পুত্রকন্যা। কিন্তু তিনি আর কখনও বিবাহ করেন নাই। বড়দা রমাপ্রসাদের স্ত্রী তারাদেবী বালক বালিকাদের দায়িত্ব নেন। তিনি বিভিন্ন কার্যে ও দেশের কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

এরপর ১৯৩৪ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দুবার তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি কনিষ্ঠতম উপাচার্য হয়েও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও বিচক্ষণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছিলেন যা দেখে অনেক প্রবীণ কর্মকর্তারা বিস্মিত হয়েছিলেন-

তাঁর কার্যপ্রণালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। ভারতীয় কালচারের সঙ্গে মানানসই প্রতীক চিহ্ন পরিবর্তন করেছিলেন।

২। বাংলা বানান পদ্ধতির সংস্কার।

৩। ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন ও পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা।

৪। বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা নির্মাণ।

৫। রবীন্দ্রনাথকে সমাবর্তন ভাষাদানে আহ্বান।

৬। বাংলা ভাষায় পি, এইচ, ডি গবেষণা পত্র করার অনুমোদন

৭। কলেজে আই, এসসি. কোর্স চালু করা।

৮। সেকেন্ডারী থেকে এম. এ পর্যন্ত ভূগোল পড়ার ব্যবস্থা।

৯। চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষার চর্চার ব্যবস্থা।

১০। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।

১১। সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ও ফলিত পদার্থবিদ্যায় কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা।

১২। ইউনিভারসিটি রোয়িং ক্লাব ও অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা।

১৩। শিক্ষকদের জন্য টিচারস ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন।

১৪। ছাত্রদের জন্য স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার বোর্ড স্থাপন।

১৫। মুসলিম ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্বোধন করেছিলেন।

১৬। কৃষি বিষয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা।

এই সময় বাংলার ভাগ্যে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এল। ব্রিটীশ সরকার সাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা শুরু করতে আরম্ভ করলেন। 'রামজে ম্যাকডোনাল্ড' সূত্র অনুসারে হিন্দুদেরও উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীতে বিভক্ত করার চক্রান্ত শুরু করলেন। ইহার প্রতিবাদে গান্ধীজি তাঁর নীতি অনুযায়ী অনশন শুরু করলেন। তখন তপশীলি প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ানো হয়। তাদের একাংশ মুসলিম লীগের সংস্পর্শে এসে সমাজকে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করল।

এই অবস্থায় ১৯৩৫ সালে গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পাস হয় এবং ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস হিন্দুদের সব ভোট পেয়েছিল। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি মুসলমানদের ভাল ভোট পায়। সেই ফাঁকে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসল। এখানে উল্লেখ্য ১৯২৯ সালে লাহোর সম্মেলনে 'মুসলীম লীগ' গঠনের প্রস্তাব পাস হয়। এই সময় যদি কংগ্রেস ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি মিলিতভাবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করত তাহলে বৃটিশ মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাজিত করে বাংলায় একটি অসাম্প্রদায়িক, শক্তিসম্পন্ন প্রদেশে পরিণত হত এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে বাংলাকে বাঁচানো যেত। কিন্তু কংগ্রেস দূরদর্শী হতে পারল না। তাই বাংলায় প্রথম নির্বাচনেই সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। যদিও বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি সর্বত্র হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় তাঁদের কোনওপ্রকার কার্যকরী ভূমিকা রইল না, শুধু বিধানসভায় গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া এবং যোগ্যতার মানদণ্ড না বিচার করে সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক বিচারে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা শুরু হল। এই ঘটনার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে 'শ্রী ও পদ্ম' এবং 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দুত্বের ছোঁয়া আছে বলে সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া তুললেন মুসলীম লীগ।

এই সরকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল পাস করিয়ে হিন্দুদের প্রতিনিধি হ্রাস করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সরিয়ে সেকেন্ডারী বোর্ড স্থাপন করলেন, লক্ষ্য মুসলীম লীগের কর্তৃত্ব স্থাপন, যদিও বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলীমদের অবদান শত করা পাঁচ ভাগ। কংগ্রেস হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত তবুও মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত ক্ষমতা বা দৃঢ়তা দেখাতে পারলেন না পাছে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ লাগে। কোনওরকম সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এল না।

এতদিন পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের সমর্থন কংগ্রেসের প্রতিই ছিল যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে ছিলেন না এবং শিক্ষাক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করছিলেন। হিন্দুদের স্বার্থক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে কংগ্রেস নেতাদের দ্বারস্থ হলেন যাতে করে তাঁরা হিন্দু স্বার্থবিরোধী সরকারী নীতির প্রতিবাদ করেন ও বিরোধীতা করেন। কিন্তু কংগ্রেস অবিশ্বাস্যভাবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষায়

এগিয়ে এল না। শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার ছাপ লাগানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি জনমত জাগাতে শুরু করলেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। প্রথমেই তিনি শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে হিন্দুদের উপর অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে অনুরোধ করলেন, স্বভাবতঃই ইহার মধ্যে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ছাপ ছিল না। বাংলায় তখন কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত এবং সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছেন। কোনও কংগ্রেস নেতাই হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এলেন না। উপরন্তু সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মুসলীম লীগের উপর তুলে দিলেন।

এই সময় ১৯৩৯ সালে ব্রিটীশের পরোক্ষ সমর্থনে মুসলীম লীগ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবনা, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ বিরাট আকারে দাঙ্গা ঘটায় এবং হিন্দু মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার শুধু করে। যেহেতু হিন্দুরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল তাই ব্রিটিশ সরকার তাঁদের একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। তাই এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কোনও প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করল না উল্টে হিন্দু নিধনকারীদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করে এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিতে তাদের মনোনীত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে। আর কংগ্রেস হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও অবিচার মুখ বুজে সহ্য করে নিল, কোনপ্রকার আপত্তিও করল না, প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা। শুধুমাত্র মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে।

এদিকে ১৯৩৭ সালে বীর দামোদর বিনায়ক সাভারকর মুক্তি পান। ১৯১০ সালে তিনি বিপ্লবী নেতা হিসাবে শাস্তি পান। তাঁকে লন্ডনে ব্যারিষ্টার পড়ার সময় বন্দী করা হয়। ১৯০৯ সালে জুলাই মাসে মদনলাল ধিংরার গুলিতে ব্রিটেনের ভারত শাসন দপ্তরের প্রধান স্যার কার্জন উইলি নিহত হল। তিনি এই ব্যাপারে জড়িত ছিলেন ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কারণে তাঁর গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১১ সালে তিনি আন্দামানে সেলুলার জেলে দ্বীপান্তরিত হন। আন্দামানের সেলুলার জেলে কি অমানুষিক নির্যাতন চালানো হত তা অনেকেই হয়ত জানে না। ওখান থেকে কেউই ফিরে আসত না। মৃত্যুই একমাত্র ভবিতব্য থাকত। ওখানে তিনি প্রায় বার বছর অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন তারপর দেশের কারাবাস ভোগ করেন এবং শেষে অন্তরীণ অবস্থায় দিন কাটান। তারপর ১৯৩৭ সালে ২৭ বছর পর মুক্তি পান। জীবনের অমূল্য সময় তিনি কারান্তরালে কাটান। এতদিন কেউই কষ্ট সহ্য করে বাঁচতে পারে না। কিন্তু সাভারকর-বীর সাভারকর অদম্য মনোবল নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তিনিও একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। জীবনে শিক্ষাক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করতেন। যখন তিনি সাজা পান তখন দাদারও আন্দামানে দ্বীপান্তর হয়েছে ছোটভাইও কারান্তরালে। বাড়ীতে শিশুপুত্র যুবতী বৌদি। মাথার উপর কোনওপ্রকার অভিভাবক ছিল না। কি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ এই সাভারকর পরিবারের। খুব কম লোকই তাঁর নাম জানে। তিনি এত বড় বিপ্লবী ছিলেন যে লন্ডন থেকে হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে

জাহাজে করে আনা হয়েছিল। তারমধ্যেও তিনি বাথরুম যাবার নাম করে পায়খানার প্যানের ভিতর দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এবং সাঁতার কেটে ফরাসী বন্দরে উঠেছিলেন। তখন ইঙ্গ-ফরাসী চির প্রতিদ্বন্দ্বী। নিয়ম অনুযায়ী ইংরাজদের কোনও বন্দী ফরাসী দেশে থাকলে তাঁর বিচার ইংরাজ করতে পারবে না। তাই দেখে অনেক বিপ্লবী চন্দননগরে এসে আশ্রয় নিত। এই চিন্তাধারা নিয়ে তিনি সমুদ্রে সাঁতার কেটে ফরাসী দেশে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য আমাদের দুর্ভাগ্য ফরাসী সরকার তাঁকে বৃটিশদের হাতে তুলে দিলেন। আগেই বলেছি বিচারের প্রহসনে তাঁর দ্বীপান্তর হয়। তিনি কিন্তু বিপ্লবী হিসাবেই বন্দী হয়েছিলেন এবং ২৭ বছর কারান্তরালে ছিলেন। ভারতের জেলে থাকার সময় বা অন্তরীন থাকার সময় থেকেই তিনি মুসলিম তোষণকারী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি হিন্দুত্বের পক্ষে যে দল গঠিত হয়েছিল যাহা ১৯১৪ সালে অমৃতসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাঁর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্য ছিলেন সেই দলে যোগদান করলেন এবং সেই দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

১৯৩৯ সালে বীর সাভারকরের নেতৃত্বে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হয়। উপায়ান্তর না পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। তারপর তিনি ১৯৪০ সালে হিন্দু মহাভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪০-৪৪ বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদে আসীন হন। শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে শুধু ব্রিটিশ বিরোধীতা করে জাতীয়তাবোধ জাগানো যাবে না একমাত্র দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রীয় চেতনা মানুষের মনে জাগ্রত করতে হবে। তাই তিনি কংগ্রেসীদের দেশ নিয়ে ছেলেখেলার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন, যিনি একজন দেশপ্রেমিক এবং ১৯২৫ সালে হিন্দুত্বের জাগরণের জন্য অরাজনৈতিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (R.S.S) গঠন করেন।

১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলীম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। মহঃ আলি জিন্না যিনি লীগের সভাপতি ছিলেন তিনি বললেন হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা ধর্মই নয় আলাদা জাতি। তাঁরা সংখ্যালঘুই নয়, তাঁদের নিজস্ব বাসভূমির অধিকার আছে যাহা হিন্দু বন্ধুরা ঠিক বুঝতে পারছে না। কমিউনিস্টরা জিন্নার বক্তব্যকে সমর্থন করল—তাঁরা বলল "The Pakistan is a just Progressive, and national demand"। তাঁদের আলাদা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার তরফ থেকে দেশ বিভাগের বিরোধীতা শুরু করলেন এবং তিনি মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও কাপুরুষ কংগ্রেসের প্রতিবাদ না করার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন এবং ঘোষণা করলেন হিন্দু মহাসভা সর্বশক্তি দিয়ে তা রুখে দাঁড়াবে। এই সময় হয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশের অসহযোগিতা করা হবে জানালেন। যুদ্ধের জন্য সেনার প্রয়োজন, কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা যুব সমাজকে যুদ্ধে যোগ

না দেওয়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদজী যুবকদের সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে বললেন। ঐ সময় ভারতীয় তথা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে হিন্দুদের সংখ্যা খুবই কম ছিল, বেশীর ভাগ সেনাই মুসলমান। দেশ গঠনে সেনাবাহিনীর কথা চিন্তা করে তিনি ভারতীয় তথা হিন্দুদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বললেন। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল হিন্দু তথা ভারতীয় সেনার আধিক্য যাহা স্বাধীন ভারতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্য্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। না হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের আধিক্য থাকত এবং সেটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে খুব একটা স্বস্তিদায়ক হত না। ১৯৪১ সালে তিনি একথাও বলেছিলেন ইংরাজ দায়ে পরে সামরিক শিক্ষা দিচ্ছে। এই শিক্ষা নিয়েই আমাদের ছেলেরা সমরবিদ্যায় আধুনিক হয়ে উঠবে এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সুভাষ বোস পরে এই সত্য প্রমাণ করেছিলেন। সুতরাং কংগ্রেসের যুদ্ধনীতি যে ভুল ছিল প্রমাণিত হয়ে গেল।

১৯৪১ সালে মুসলীম লীগ সরকারের স্থায়ীত্ব নিয়ে সংকট দেখা দিল। ফজলুল হকের সঙ্গে মি. জিন্নার মনোমালিন্য শুরু হল। মি. জিন্নার দলের লোকেরাও তাঁর উদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারিতায় বিরক্ত হয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে যোগ দিল। ফজলুল হক সাহেব ও হিন্দু সদস্যদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের আহ্বান জানালেন হিন্দু নেতাদের। ডঃ মুখার্জী এই আহ্বানে সাড়া দিলেন মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঠেকানোর জন্য। তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিলেন এবং অর্থদপ্তরের ভার নিলেন এবং প্রায় একবছর সরকারে ছিলেন।

১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করে এবং ব্রিটিশ কোনও প্রকার ঘোষণা ছাড়াই নেতাদের গ্রেপ্তার করে। এর ফলে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। মেদিনীপুরে সমান্তরাল জাতীয় সরকার গঠিত হয়। ব্রিটীশ সরকার মেদিনীপুরের জনগণের উপর খুবই ক্ষিপ্ত ছিল কেননা মেদিনীপুর বহু বিপ্লবীদের জন্ম দিয়েছিল। এবং বিপ্লবীদের হাতে তিন জন ম্যাজিস্টেট ঐ জেলায় প্রাণ দিয়েছিলেন এবং কোনও ম্যাজিস্টেট ওখানে নিয়োগ করতে পারছিলেন না। সেজন্য ব্রিটিশ সরকার ওই আন্দোলন দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

ঠিক এই সময় মেদিনীপুরে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণীঝড় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়, যার ফলে ওখানে জনগণ প্রভূত দুঃখ দুর্দশায় পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই সমস্ত খবর যাতে না পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করেন। শ্যামাপ্রসাদ বেসরকারী সূত্রে খবর পেয়ে ওখানে ছুটে গেলেন এবং জনগণের দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করলেন এবং সরকারের কোনও প্রকার সাহায্যের ব্যাপারে উদাসীনতাও লক্ষ্য করলেন। সরকারে থেকে কিছু করতে না পারার বেদনায় তিনি ২৩ শে নভেম্বর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। কয়েকমাস বাদে ব্রিটীশ সরকার ফজলুল হক সরকারকে বরখাস্ত করে পুনরায় মুসলীম লীগকে ক্ষমতায় বসালেন।

মেদিনীপুরের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এক লক্ষ ঘর বাড়ী ধ্বংস হয় এবং প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগের মত গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটে। সরকার ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে এল না তো বটেই জেলা শাসক অমানবিক মন্তব্য করেছিলেন— রাজনৈতিক দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য তো বন্ধ করা উচিৎই এমন কি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও ত্রাণকার্য করতে দেওয়া উচিৎ নয়। শ্যামাপ্রসাদ তখন 'সাইক্লোন রিলিফ কমিটি' গড়ে তোলেন। তিনি এই কমিটির সভাপতি, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় কোষাধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। এছাড়া বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য পলিটিক্যাল সাফারার রিলিফ কমিটি গঠন করেন।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার পর ব্রিটিশ খাজা নিজামুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলীম লীগ সরকারকে শাসন ক্ষমতায় বসালেন। ঐ বছর এক দুর্ভিক্ষ হয় যাহা বাংলায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে বিখ্যাত। এই দুর্ভিক্ষকে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ বলা হয় এবং মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তর বলা হয়। প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এ দুর্ভিক্ষের বলি হয়। মানুষ কুকুর শেয়ালের মত মরতে লাগল কিন্তু মুসলীম লীগ নির্বিকার এবং সংবাদপত্র যেন এই ব্যাপারে কোন প্রকার সংবাদ পরিবেশন না করতে পারে তার কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ একটি মাসিক পত্রিকায় এই মর্মান্তিক সংবাদ পরিবেশন করেন যা দেখে সারা দেশ মুহ্যমান ও স্তম্ভিত হয়ে যায়। এর জন্য ঐ পত্রিকা ও শ্যামাপ্রসাদ তিরস্কৃত হন। সে সবের তোয়াক্কা না করে তিনি তাঁর কর্তব্যচ্যুত হলেন না। তিনি শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ত্রাণকার্যে অংশ নিলেন। কিন্তু মুসলীম সরকার তখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করলেন। জনমতের চাপে ত্রাণকার্যে এগিয়ে এলেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ মুসলীম জনগণের ত্রাণকার্যে পাশে দাঁড়ালেন। এই দুঃসময়েও কংগ্রেসও নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হল না। কংগ্রেস নেতা জি.ডি. বিড়লা মুসলীম লীগ তহবিলে প্রচুর অর্থ দিলেন যাহা কেবলমাত্র মুসলীম জনগণের সাহায্যে ব্যবহৃত হতে লাগল। ত্রাণ কার্য নিয়ে নানা রকম দুর্নীতিও শুরু হল। খাকসার পার্টিও অন্যান্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সাহায্যের নামে হিন্দু বালক বালিকাদের ধর্মান্তকরণ শুরু করে। শ্যামাপ্রসাদ এই সংবাদ শোনার পর ঐ সমস্ত সংস্থাকে অনাথ হিন্দু বালক বালিকাদের হিন্দু মহাসভা বা অন্যান্য সংগঠনের হাতে তুলে দিতে বলেন। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের চাপে সরকার ঐ দাবী মানতে বাধ্য হন।

আর একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই কংগ্রেসী নেতাদের জেলে বন্দী করা হয়েছিল। হিন্দু মহাসভা সব শক্তি দিয়ে এই ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী জানিয়ে এসেছে, বিপদে আপদে দেশকে এগিয়ে নিয়ে তথা সেবা করার চেষ্টা করে গেছে। ব্রিটিশ মুসলীম লীগের মিলিত প্রচেষ্টায় হিন্দু অত্যাচারিত হয়েছে তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে।

আর একটা কথা এখানে বলা দরকার মুসলীম লীগের প্রতিপত্তি শুধু ইংরাজের সহায়তায় বাড়েনি, কংগ্রেসি নেতৃত্ববৃন্দ লীগের অনেক আবদার সহ্য করেছেন জিন্নার পায়ের তলায় গান্ধীজি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লুটিয়ে পড়েছিল। এই তোষণ নীতির ফলে লীগের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর একথা স্বীকার করতেই হবে যতই লীগকে অপছন্দ করা হোক না কেন মুসলীম জনসমাজের লীগের প্রতি এক অভূত পূর্ব প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। তাঁরা ভাবত কী করে মুসলমান গরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের জাতীয় শক্তি ও কৃষ্টি সমৃদ্ধ হবে এই চিন্তা করত। কিন্তু হিন্দু হিসাবে হিন্দু সমাজ এই চিন্তা করত না। কংগ্রেস ভারতে জনসাধারণ মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান রূপ নিয়ে যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছে তার বিরুদ্ধে হিন্দুকে রক্ষা করার কোন শক্তি দান করতে পারে নি যাহা হিন্দু মহাসভা বহুলাংশে করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতে শতকরা ৭৫ ভাগ হিন্দু, যদি ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠে সেখানে হিন্দুদের প্রভাব বেশী থাকবে আর ভারতকে ভাগ করার কোনও প্রস্তাবই হিন্দু মহাসভা মানতে রাজী ছিল না।

কিন্তু ১৯৪৪ সালে দেখা গেল কংগ্রেস প্রকারান্তরে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাংলা সহ পাকিস্তানের প্রস্তাব দিয়াছেন এবং গান্ধীজি ইহা সমর্থন করেছেন, ইহার ফলে কংগ্রেস এক প্রকার পাকিস্তানের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন-প্রমাণিত হল। লীগও বুঝল কংগ্রেস তাদের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করেছে। শ্যামাপ্রসাদজী বিষয়টা বুঝলেন এবং আসন্ন সংকটের কথা চিন্তা করে সমস্ত জাতীয়তাবাদী শক্তিকে কংগ্রেসের আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বললেন। জেল থেকে বেরিয়েই গান্ধীজি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে স্থির করলেন। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় মুসলীম লীগ জনসমর্থন কমে গিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদজী গান্ধীজিকে ভালই বুঝতেই যে তিনি জিন্নার কাছে আত্মসমর্পন করবেন। তাই তিনি গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন মুসলীম লীগের দুরাবস্থার সময় অক্সিজেন না যোগান আরও জানাতে ভুললেন না এ ব্যাপারে তিনি জনমত গঠন করতে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। তিনি গান্ধীজিকে ইহাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি একসময় বলেছিলেন 'Vivisect me befor you vivisect India"। শ্যামাপ্রসাদ চিঠি লিখে গান্ধীজিকে জানালেন—'আমরা আপনাকে কংগ্রেস থেকে আলাদা মনে করি আপনার এই পদক্ষেপ আমাদের এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন জিন্না কোন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী নন, বস্তুত তিনি নিজেকে ভারতীয় বলেই মনে করেন না। স্বাধীনতার জন্য আমাদের পূর্বসুরীরা যে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছে তাতে জিন্নার কোন আগ্রহ নেই। বাংলা তথা ভারত বিভাগের আমরা তীব্র বিরোধীতা করি। কেননা আপনিই কিছু দিন পূর্বে লিখেছিলেন দেশবিভাগের চিন্তা ভাবনা আমাদের

নূতন ধরণের বিবাদ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। আমার মনে হয় আপনার বলা উচিৎ স্বাধীনতা কেবলমাত্র সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতাতেই পাওয়া সম্ভব। অনেক মুসলমানও আজ বুঝতে পারছেন যে পাকিস্তান একট অবাস্তব চিন্তা ভাবনা। বৃটিশ সরকারও জিন্নার উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক এই সময় আপনি জিন্নাকে তুলে ধরে বলতে চাইছেন যে জিন্নাই যেন পাকিস্তানের ভরসা। যাঁরা মুসলীম লীগের রাজনীতি পছন্দ করে না সেই সমস্ত মুসলমানদের কাছে এটা একটা বিরাট আঘাত। আপনি যখন আলোচনা করবেন তখন নিশ্চয়ই ভারতীয় হিসাবে আলোচনা করবেন হিন্দু হিসাবে নয়। কিন্তু একজন ভারতীয় হিসাবে যখন মুসলমানদের দাবী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এবং সেই ব্যাপারে জিন্নাকেও তোষণ করতে প্রস্তুত তখন আমিও একজন ভারতীয় হিসাবে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার ও দাবীর কথা তুলতে পারব না কেন? আমার অনুরোধ একজন ভারতীয় হিসাবে কেবলমাত্র ভারতীয়দের কথাই চিন্তা করুন" এই চিঠিতে কিছুটা কাজ হল। কংগ্রেস বুঝল দেশের জনসাধারণের কাছে তার হেয় হয়ে যাচ্ছে। বল্লভভাই কলকাতায় এসে শ্যামাপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন কংগ্রেস পাকিস্তান দাবী মেনে নেবে না। গান্ধীজি অনুরূপ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু কংগ্রেস পুণা অধিবেশনে দেশের অখণ্ডতায় বজায় রাখা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু প্রস্তাবের শেষে ঘোষণা করলেন অনিচ্ছুক অংশগুলিকে ভারতে থেকে যাবার জন্য জোর জবরদস্তি করা হবে না। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রথম অংশ অর্থাৎ অখণ্ডতাকে জোর দিয়ে নির্বাচনে গেল এবং জনগণকে একটা বিরাট ধাপ্পা দিল। কংগ্রেসের এই ধাপ্পাতে হিন্দুরা বিশ্বাস করে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে কংগ্রেসকে ভোট দিল এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সমস্ত মুসলীম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলীম লীগ জয়ী হল। বাংলায় মুসলীম লীগ সরকার আবার অধিষ্ঠিত হল দেশবিভাগের পক্ষে জোরদার আন্দোলন শুরু করল।

১৯৪৫ সালে হয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং কংগ্রেস নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে লীগ মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠল। কংগ্রেস নেতাদের মনোবল ভেঙ্গে তাঁরা ক্ষমতা লাভের জন্য অধৈর্য্য হয়ে উঠল। ১৯৪৫ সালে যখন ওয়াভেল দেশবিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করল তখন শ্যামাপ্রসাদজী ইহার তীব্র বিরোধীতা করেন। হিন্দু মহাসভাকে বাদ দিয়ে হিন্দুদের পক্ষে গান্ধী ও মুসলমানদের পক্ষে জিন্না ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হল কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি নয় হিন্দুদের প্রতিনিধি।

১৯৪৬ সালে বৃটিশদের আমন্ত্রণে শ্যামা প্রসাদ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার তরফে বৃটিশ মন্ত্রীমিশনে দেশ বিভাগ হিন্দুদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানালেন। জিন্না কিন্তু প্রকাশ্যেই পাকিস্তানের দাবী জানান।

১৯৪৬ সালে যখন ভারতের সংবিধান সভা গঠিত হয় তখন শ্যামাপ্রসাদ বাংলা থেকে সদস্য নির্বাচিত হলেন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, সাংসদ হিসাবে যোগ্যতাও দায়িত্ববোধ তাকে এক জাতীয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল। শ্যামাপ্রসাদজী বিশ্বাস করতেন যতদিন মুসলীম লীগ ও ইংরাজদের ষড়যন্ত্র চলবে এবং হিন্দুদের উপর আঘাত চলবে ততদিন হিন্দুদের জন্য একটা রাজনৈতিক দল থাকা উচিৎ। এইদল স্বাধীনতার পক্ষে সহায়তা করবে আর হিন্দুকে রক্ষা করতে পিছ পা হবে না। উনি চাইতেন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকা দরকার।

কংগ্রেস হিন্দুদের ভোটে নির্বাচনে জিততে পারে অথচ হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় অক্ষম এবং নিজেদের হিন্দু প্রতিনিধি স্বীকার করতে অস্বীকার করে এর চেয়ে হিন্দুদের দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। কংগ্রেস মুসলমান কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করাল না দু একটি ছাড়া। যেখানে কংগ্রেসের নামে মুসলমান জয়ী হল সেগুলি হল মিশ্র ধর্মের লোকের বাস অবশ্যই হিন্দুদের ভোটার বেশী। কংগ্রেস যদি মুসলিম অঞ্চলে প্রার্থী দিয়ে জয়ী হতে পারত তাহলে বোঝা যেত মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব আছে। কিন্তু কংগ্রেস মুসলমান এমনকী শিখদের কাছেও পরাজিত হল।

হিন্দুরা তারা নিজেদের কোনও প্রতিষ্ঠান গড়তে চায় না। যে প্রতিষ্ঠান আমরা এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি তাকে স্বহস্তে ভাঙতে সে আনন্দ পায়। এর চেয়ে আর আত্মঘাতী আর কি হতে পারে। যে জাতি নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যেতে আগ্রহী, যে জাতির নিজ জাতীর গৌরববোধ নিয়ে গৌরববোধ করেনা, যে নিজের রাষ্ট্র গড়ার কথা ভাবলে বা বললে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বোধে দুষ্ট হচ্ছে বলে নিজেকে ধিক্কার দেয় সে জাতির ভবিষ্যত কী? শুধু ইংরাজ বা মুসলমানদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ইংরাজ ব্যবসা করতে এসে এদেশের শাসনকর্তা হয়েছে। এত বড় সাম্রাজ্য বা জমিদারী সহজে ছেড়ে দিতে চাইবে কেন? মুসলমান এদেশে ৭০০ বৎসর ধরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করেছিল, কখনও ভাল, কখন মন্দ ব্যবহার করেছিল। বহুসংখ্যক লোক একদিন হিন্দু ছিল তবু তারা হিন্দুবিদ্বেষী। আবার তারা রাজত্ব করবে এটা তারা বিশ্বাস করতেই পারে। এখন ইংরাজ চলে গেলে কে রাজত্ব করবে, দুপক্ষে ভাবা উচিৎ এবং স্বাভাবিক। মুসলমান তৈরি হয়ে উঠছে তাঁরা যেন হিন্দুদের তাঁবেদার না হতে হয়। যদি হিন্দু মুসলমান মিলিত ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বজায় রাখে যে যার ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বসবাস করে তাহলে তো গোলমালের কোন প্রশ্নই নেই। আর মুসলমান যদি নিজধর্মে অতিরিক্ত নিষ্ঠা দেখিয়ে হিন্দুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তবে হিন্দু কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবে, চিন্তাভাবনা করেও দেখে না। যদি অপর পক্ষ সিভিল ওয়ার চায় আর আমরা প্রস্তুত না থাকি তাহলে কী হবে। কংগ্রেস হিন্দু মুসলমানের সমস্যা কোনও মীমাংসা করতে পারেনি, পারবেও না। আপোষ যদি না হয় যে পক্ষ শক্তিশালী

সেই শেষপর্যন্ত টিকে থাকবে। একটা প্রতিষ্ঠান যে হিন্দুদের সহয়তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠছে অথচ হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করা প্রয়োজন মনে করে না বা পাপ বলে মনে করে, সেই প্রতিষ্ঠান কী লড়তে পারে অপর এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানের প্রাধান্য স্থাপন করা বা ইসলামের ধ্বজা বাড়িয়ে তোলা এই সামান্য কথা হিন্দু তার এত বুদ্ধি ও অর্থবল থাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারে না। এর চেয়ে আর দুঃখের কী কথা হতে পারে। মুসলমান ধর্মের মধ্যে এক অদ্ভুত একতা আছে যা হিন্দু ধর্ম বা সমাজের মধ্যে পাওয়া যায় না। নানা জাতি, বর্ণভেদ, প্রাদেশিকতা এই সব কারণে এক হিন্দু অপর হিন্দুর জন্য সহানুভূতি দেখায় না বা অনুভব করে না। যাহা মুসলমান তা তার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য করে তা সে ভারতে বা পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে আসুক না কেন। ভারতের সব হিন্দু এক যতদিন না এই বোধ তাদের মধ্যে জন্মাবে, ততদিন হিন্দু রাষ্ট্র বা তার জাতিগত প্রাধান্য এদেশে স্থাপিত হতে পারবে না। হিন্দু মহাসভা এই কাজ করতে ব্রতী হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম, সামাজিক কুনীতি বা সংকীর্ণতার পরিবর্তন, সাম্যবাদের উপর ধর্মের আসল ভিত্তি স্থাপন, শিক্ষার প্রসার এসব না হলে হিন্দু জাগরণ সম্ভব নয়। শুধু ব্যক্তিগত আর্থিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি এই করে হিন্দু জগতে টিকতে পারবে না। নূতন করে বাঁচতে হবে। জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। দরকার হলে অপরের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য কেড়ে নিতে হবে এই রকম একাগ্রতা ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে। শুধু তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাদের এই কার্যপ্রণালী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। কিন্তু শেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কয়জন।

এইবার বলি ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা তথা গণহত্যার কথা। মুসলীম লীগ পাকিস্তানের দাবীতে দাঙ্গা শুরু করল। বোঝাতে চাইল হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে থাকতে পারে না। তারা সমগ্র বাংলাকে কুক্ষিগত করতে চাইল কেননা বাংলার লোকের বিশেষ করে হিন্দুরা পাকিস্তানের সাথে থাকতে চাইছেন না। তাই ১৬ই আগষ্ট এক গণহত্যা সরকারী তত্ত্বাবধানে শুরু হল যাহা 'Direct Action-1946' নামে পরিচিত যার সম্পর্কে কোন ধারণা আজকের প্রজন্মের নেই বা ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

১৬ই আগষ্ট মুসলীম লীগ হরতাল ডাকল এবং সরকারী ছুটী ঘোষণা করল যাতে করে মুসলীম সরকারী ও বেসরকারী কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকেদের নিজস্ব অংশ ভাগ করে দেওয়া হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য। ভোর না হতেই বিস্তীর্ণ হিন্দু এলাকায় মুসলীম গুণ্ডা বাহিনী অসাবধান ও অপ্রস্তুত হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুটপাট, খুন, জখম ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদিতে হিন্দু কলোনীতে বা এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলীম গুণ্ডাবাহিনী। লালবাজারে বসে সুরাবর্দী, সেরিফ খান, প্রমুখ মুসলীম নেতারা দাঙ্গা পরিচালনা করেছিল।

এই দাঙ্গা সফল করার জন্য আগে থেকেই সরকার প্রস্তুতি শুরু করেছিল। বাইরে থেকে প্রচুর মুসলমান আমদানি করা হয়েছিল। বিভিন্ন মুসলমান অঞ্চলে মুসলমানদের অস্ত্রে শান দিতে দেখা গিয়েছিল কসাইখানার কসাইদের সক্রিয় ভূমিকায় লাগান হয়েছিল। বহু জায়গায় লাঠি, ছোরা, তরওয়াল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি লরি, ঠেলাগাড়ি আনা হয়েছিল। বহু সংখ্যক লরিকে অস্ত্র বহনে লাগান হয়েছিল। কলকাতার মেয়র ওসমান, সুরাবর্দী প্রমুখ পেট্রোলের ঢালাও কুপন ইসু করে ১৮ আগষ্ট পর্যন্ত। ওই সব লরিগুলি গুণ্ডাদের পরিবহণ ও লুটপাটের কাজে লাগান হয়েছিল।

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটাই কারণ যাতে করে কংগ্রেস নেতারা মাথা নত করে দেশ বিভাগ মেনে নেয়। এই সময়ে শ্যামাপ্রসাদ জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করেছিল। মুসলীম লীগের গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে আক্রান্ত জনগণ উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ করেছিল। এব্যাপারে গোপাল মুখার্জী ওরফে 'গোপাল পাঁঠা' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

উল্লেখ্য লীগ ঐ বছর নির্বাচনে একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং সোনার বাংলায় ছোরা মারা রাজনীতি শুরু করে। তার ২য় ছোরা মারা শুরু হল ঐ বছর কোজাগরী লক্ষীপূজার দিন অর্থাৎ ১০ অক্টোবর। কলিকাতার দাঙ্গার পর নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু করে। আল্লাহো আকবর। পাকিস্তান জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মালাউনের রক্ত চাই এই শ্লোগানতুলে নিরীহ, নিরস্ত্র হিন্দুদের উপর মুসলীম গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। বীভৎস হত্যাকাণ্ড, লুট দাঙ্গা, হিন্দুদের ঘরে আগুন লাগান, ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ শুরু হল। পালাবার পথ অবরুদ্ধ করে দেওয়া হল। রাস্তা কেটে, পুল বা সাঁকো ভেঙ্গে। পথঘাট লীগের স্বেচ্ছাসেবক অবরুদ্ধ করে রাখল। নৌকার মাঝিমাল্লারা সব্বাই মুসলমান। নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর পার্শ্ববতী ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুর, ফরিদপুর ইত্যাদি জায়গায় হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ শুরু হল।

শ্যামাপ্রসাদজী নেরোখালী ও ত্রিপুরা জেলার উপদ্রুত অঞ্চল সফর করে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উল্লেখ করলাম। এই দাঙ্গা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে অভূতপূর্ব, যাকে কোন প্রকারেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যায় না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে সংঘটিত ও সুপরিপরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে ধর্মান্তকরণ, লুণ্ঠন, বিগ্রহ ও দেব মন্দির অপবিত্র করণ। ধর্ষণ, নারীহরণ, বলপূর্বক বিবাহ এই কুকার্য্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল। হত্যাকাণ্ডও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল। এই সকল কার্য প্রণালী চিন্তা করলে বোঝাযায় হিন্দু লোপ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এই ঘটনার পর নোয়াখালিতে মাত্র ৫০ জন ও ত্রিপুরায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুদের উপর যে অপমান ও নির্যাতন হয়েছে তার তুলনা নাই। হিন্দুদের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে মহিলাদের অপমানিত করা হইয়াছে। হিন্দুদের মসুলমানদের মতন পোষাক পরতে, আহার

করিতে, জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। পুরুষদের মসজিদে যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে।

আমাদের শত সহস্রভ্রাতা ও ভগিনীগণ নতিস্বীকার করে হিন্দু সমাজের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে বলে মনে করি না। তাহারা হিন্দু ছিলেন। হিন্দু আছেন এবং আমরণ হিন্দু থাকিবেন। যখনই কোন মহিলাকে উপযুক্ত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে তাঁকে বিনা বাধায় স্বীয়পরিবারে ফিরিয়ে নিতে হবে। যে সকল কুমারী মেয়েকে উদ্ধার করা হইবে তাহাদের স্বধর্মে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি হিন্দু সমাজ দুরদৃষ্টি সহ বর্তমান বিপদে স্বেচ্ছায় এগিয়ে না আসে তা হলে সেই সমাজের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এই দুরবস্থার জন্য শাসকগোষ্ঠী ও গভর্ণর দায়ী এই শাসন ব্যবস্থা জারী থাকলে হিন্দুদের ধনপ্রাণ ভয়ংঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবে। আর হিন্দুদের বুঝতে হবে যে তারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয় তাদের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।

এই দাঙ্গা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হিন্দুদের শেষ করে দিতে না পারলেও কংগ্রেস নেতাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং গান্ধী সমেত কংগ্রেসীরা দিশহারা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য নেহরুর কাছে ইহা একপ্রকার আশীর্বাদ হয়েছিল কেননা তখন নেতাজীর ভয়ে নেহরু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময় লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশ বিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে ভারতে পদার্পণ করলেন। তখন শ্যামাপ্রসাদজী বুঝলেন দেশ বিভাগকে আর আটকানো যাবে না।

দেশভাগের যখন পরিকল্পনা করা হচ্ছে তখন অনিচ্ছুক প্রদেশগুলিকে ভারতে থেকে যাবার জন্য জোর জবরদস্তি করা হবে না বলে কংগ্রেস আগেই ঘোষণা করেছিল। এর ফলে পাঞ্জাব ও বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে স্থির করা হল। লীগ সমগ্র বাংলাকেই এবং পাঞ্জাবকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। তখন শ্যামাপ্রসাদজী বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী তুলল। কেননা যে হিসাবে পাকিস্তান দাবী করা হচ্ছে সেই হিসাবে বাংলার পশ্চিমাংশ ও পাঞ্জাবের পূর্বাংশ ভারতে যাবার কথা। তখন মুসলিম লীগের চক্ষু 'ছানা বড়া' যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারে নি। হিন্দুরাও মুসলমানদের অত্যাচার ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখে আর অখণ্ড বাংলা চাইল না। তা দেখে সুরাবর্দী সাহেবরা প্রমাদ গুণলেন। তখন তাঁরা অখণ্ড বাংলা বা বাঙালী স্থানের ধুয়া তুলল। শরৎ বোস, কিরণ শঙ্কর রায় সুরাবর্দী সাহেবের তালে তাল দিলেন। হিন্দুরা ভীত সন্ত্রস্ত ও নারকীয় ভয়াবহ অত্যাচার দেখে আর অখণ্ড বাংলা বা বাঙালীস্থানে থেকে মুসলমানদের হাতে যেতে রাজী হল না। শ্যামাপ্রসাদজীও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম শাসনে স্বাধীন বাংলা গঠনে রাজী হল না। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠন করে ভারতে থাকার দাবী তুলল। ব্রিটিশ ও মুসলীম লীগ আর ঐ প্রস্তাব না করতে পারল না। তাই এক তৃতীয়াংশ বাংলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সৃষ্টি হল আর পাঞ্জাব হিন্দু ও শিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত থাকল। কারণ তিনি বুঝেছিলেন

ক্ষমতার জন্য কংগ্রেস সমগ্র বাংলা এমনকী অসমকে পর্যন্ত পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা বোধ করবে না। মূলত শ্যামাপ্রসাদজীর প্রচেষ্টায় এক তৃতীয়াংশ বাংলা ভারত অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এজন্যে তিনি গর্ব করে বলেছিলেন। 'Congress partitiond India and I partitiond Pakistan' এই ভাবে তিনি মুসলীম লীগ ও ব্রিটীশের দুরভিসন্ধি বানচাল করে দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে বাংলা ও পাঞ্জাবে লোক বিনিময়ে কথা উঠল। কিন্তু পাঞ্জাবে এটা সম্ভব হল বাংলায় হল না কারণ নেহরুর বাঙালী স্থানের ভয়। যদি লোক বিনিময় হয় তাহলে বিহারে একটা বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবে যাহা নেহরুর মনপূত ছিল না। উনি তো গোটা বাংলাটাকেই পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন কেন না বাংলার নেতারা তার কাজের চালাকি ধরে ফেলত তাঁর সমালোচনা করত। তাই তিনি লোক বিনিময় প্রথা বাংলায় চালু করলেন না তাহলে একটা স্থায়ী সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

এর পর ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ১৫ই আগষ্ট সরকার গঠন করে। নেহরু প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন যা তার বহুদিনের আকাঙ্খা ছিল। শ্যামাপ্রসাদজী হিন্দু মহাসভার সংস্রব ত্যাগ করে মন্ত্রীসভায় যোগ দেন এবং শিল্প সরবরাহ দপ্তরের ভার নেন। তিনি হিন্দু মহাসভাকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করে সামাজিক ও সংস্কৃতিক কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানালেন, মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর।

বস্তুত বিভাজনের ফলে স্বাধীনতার আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে গেল তাদের একাংশ পরদেশী হয়ে গেল। নদীয়া জেলার লোকেরা ভেবেছিল তারা পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরে ১৮ই আগষ্ট তারা জানতে পারে যে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাই হোক সকলে আশা করেছিল যে অংশ স্বাধীনতা পেয়েছে তাকে সংঙ্ঘবদ্ধ করে পুনর্গঠনের কাজ করবে এবং পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত প্রদেশে হিন্দুদের অমুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। কেননা ঐ অংশের জনগণ শ্যামাপ্রসাদকে তাদের অভিভাবক বলে মনে করত এবং তাঁদের জন্য তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। হিন্দু মহাসভাকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন কিন্তু ১৯৪৮ সালে হিন্দু মহাসভা আবার রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করায় হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সভা থেকে পদত্যাগ করেন।

দুদেশের স্বাধীন সরকার গঠন হওয়ার পর মোটামুটি শান্তিতে কাটছিল। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা ২৫ থেকে ২৮ শতাংশ সরকারী কমবেশি ছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রায় ৫০ শতাংশ ছিল। এই অংশে থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হবে ও মুসলমানরা ওই স্থান দখল করবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। মুসলমানদেরও হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা ছিল না। ১৯৫০ সালে সামান্য এক গুজব থেকে পূর্ব বাংলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। ফজলুল সাহেব কলকাতা এসেছিল পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁর বিষয়

সম্পত্তি বিক্রির বন্দোবস্ত করতে। এই সময় বরিশাল ও অনান্য জায়গায় গুজব ছড়িয়ে পড়ল হক সাহেবকে নাকি হিন্দু গুণ্ডারা খুন করেছে। এই নিয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারী বরিশাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। এই কথা শুনে হক সাহেব তড়িঘড়ি করে পূর্ববাংলায় ফিরে গেলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় সভা করে জানালেন যে 'তোমরা দেইখ্যা যাও আমি মরি নাই।' আগুনের লেলিহান শিখার মত এই দাঙ্গা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, করিদাষুর, খুলনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ই ফেব্রুযারী থেকে পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হল। এই দাঙ্গায় প্রায় ৩৫ লাখ হিন্দু এদেশে চলে এল। প্রতিহিত শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে শিল্পাঞ্চলের জেলাগুলিতে। পশ্চিমবঙ্গের এক নূতন প্রজন্ম দেখা দিল যাদের জন্ম রেললাইনের পাশে জবর দখল কুঁড়ে-ঘরে। রেলগাড়ী পরিত্যক্ত কামরায়। কলিকাতার পতিতালয়ে বাংলা উচ্চারণের মেয়েদের কথাবার্তা শোনা গেল।

এই সময় একটা কথা না উল্লেখ করে থাকা যায় না। পূর্ব বাংলা জমি জায়গার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দখলে। চাকুরী বাকুরীও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দখলে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ও মুসলামান চাষ, মজুরী ও অনান্য কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। সুতরাং তপশীল নেতা যোগেন মন্ডল ঘোষণা করলেন তপশীলি জাতি ও মুসলমানরা শোষিত বঞ্চিত। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শোষক। সুতরাং ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা ও মুসলমানরা সুখে থাকব, তাই তিনিও তার সম্প্রদায়কে হিন্দু বিতাড়নে সাহায্য করতে বললেন। ফলে যা হবার তাই হল। মাথা চলে গেল। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে মুসলীমের সর কারে থেকে রাজত্বে শুরু করলেন। কিন্তু তিনিও ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় সম্বিত ফিরে পান। তখন ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। তিনি মন্ত্রী হয়েও হিন্দুদের কোনও প্রকার সাহায্য করতে পারলেন না উল্টে তাঁর পরিবারের উপর অত্যাচার হবে এমন কথাও শুনতে হল। সমস্ত থানা পুলিশ মুসলমান কর্মচারী তাঁদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে দাঙ্গা, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ চলতে থাকল। সরকার কোনও প্রকার কড়া পদক্ষেপ নিল না। উল্টে হিন্দুদের সম্পত্তি ও নারীদের লুট করার প্রতিযোগিতা সুরু হয়েগেল। তিনি নিজেও ভারতে চলে আসতে বাধ্য হলেন। মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর কী ধারণা হয়েছিল তাঁর লেখা আলোচনা ও বক্তব্য থেকে জানতে পারবেন।

১৯৫০ সালের শেষভাগ থেকে হিন্দুদের আক্রমণের ঘটনা কমতে শুরু করল কিন্তু হিন্দুরা ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবে আর ওই দেশে থাকতে রাজী হল না। তারা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে বা উত্তর পূর্বাঞ্চলে চলে যেতে শুরু করল। কেননা ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় পরিকল্পিত ভাবে হিন্দুদের নিষ্ঠুরভাবে খুন বা হত্যা করা হয়েছিল। সরকারী হিসাবেই ৫০ হাজার মানুষ খুন, হাজার হাজার হিন্দু নারীদের লুণ্ঠন করা হয় এবং তাঁদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে। সামাজিক ভাবে সমস্ত সচেতন হিন্দুদেরই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়ন করা হয়। পাকিস্তান তথা পূর্ব বাঙ্গলার সরকারের প্ররোচনাতেই এই সমস্ত

অমানবিক কাজ সংঘটিত হয়েছিল। তখন শ্যামাপ্রসাদজী বহু যুক্তি দ্বারা পূর্ববাংলার হিন্দুদের অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে জওহরলালকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর অমানবিক হৃদয় পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলেন, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনওপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তিনি পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির সঙ্গে এক চুক্তি করেন, যাহা নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ। মাইনরিটি কমিশনের ঘোষণা এবং মাইনরিটি অধিকার রক্ষা করার কথা ঘোষণা করা হল। পকিস্তান সরকার যে উদ্বাস্তু আগমন ও হিন্দুদের সুরক্ষা না দেওয়ার জন্য দায়ী তা ঘোষণা করা হল না। পাকিস্তানের প্রতি নেহরু তোষণ নীতির ব্যাপারে মত পার্থক্য হওয়ার এবং হিন্দুদের ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতায় তিনি মন্ত্রীসভা থেকে ৮ই এপ্রিল পদত্যাগ করেন এবং হিন্দু উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য সচেষ্ট হন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন মন্ত্রীসভায় থেকে তিনি দেশের কোনও মঙ্গল করতে পারবেন না। তাঁর এই পদত্যাগ অন্যান্য মন্ত্রীদের বিশেষ করে সর্দার প্যাটেলের ভাল লাগেনি। নেহরুও শ্যামাপ্রসাদজীকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি নাম যশ মোহের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে জনগণের প্রতি বিশেষ করে হিন্দুদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যা লঘুদের সমস্যা সমাধানে সারা ভারতের প্রতি যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহাতে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট ব্যাতিত সমস্ত রাজনৈতিক দল তাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কংগ্রেস ইহাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলে প্রচার শুরু করল।

এরপরে সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর নেহরুর বিরুদ্ধে কথা বলার মত কেউ ছিল না। এরপর শ্যামাপ্রসাদজী ১৯৫১ সালের জুন মাসে 'জনসঙ্ঘ' বা পিপলস পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলের মূলনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, উদ্ধাস্তু পুনর্বাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ভারতীয় কৃষ্টি ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকারের পাকিস্থান তোষণের বিরোধিতা করা। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ঐ বছর অক্টোবর মাসে দিল্লীতে জনসঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন হল। এই দলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নেতারা হলেন লালা হংসরাজগুপ্ত, অধ্যাপক বলরাজ মাধাক, লালাবলরাজ ভাল্লা, শ্রী ধরমবীর, পণ্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্মা, ভাই মহাবীর, চৌধুরী শ্রীচন্দ্র। নূতন দল গঠন করে তিনি বলেন এই দল সুসংগঠিত বিরোধী দলের কাজ করবে। বিরোধীতার অর্থ এই নয় যে সবসময় অর্থহীন বা ধ্বংসাত্মক বিরোধীতা করতে হবে। সব সমস্যার প্রতি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং সত্যিকারের গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপার ব্রতী হবে।

পাকিস্তানের ব্যাপার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল-যে ভারতবিভাজন একটি মর্মন্তুদ মুর্খতার কাজ। ইহার দ্বারা কোনও উপকার তো হয়নি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। আমরা পুনরায় অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যে বিশ্বাস করি।

আমাদের দল দেশ বিভাগের পর সংখ্যালঘু ও উদ্বাস্তুদের সম্পত্তির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে চায় যাহা কংগ্রেস সরকার সুপরিকল্পিত ভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অবশ্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িক নয়। এগুলি প্রধানত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, যাহা দুই দেশের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সোজাসুজি ভাবে সমাধান করতে হবে।

নেহরু তাঁর ও দলের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদারিকতার ধূয়া তোলেন তার অভিযোগ উত্তরে তিনি বলেন—মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কাছে ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তাকে বলি দিয়ে, দেশ বিভাগের পরেও পাকিস্তান সরকারের খামখেয়ালীপনা ও অন্যায়ের সামনে আত্মসমর্পন করার পর সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তাঁর মুখে মানায় না। তিনিও তাঁর দল নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য মুসলীম তোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন তাহা ছাড়া আর কোন সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। আজ আমাদের দেশের মধ্যে প্রাদেশিকতা জাত, পাতের নানা সমস্যা আছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হই। সাম্প্রদায়িকতার ধূয়াতুলে নেহরু আসল সমস্যাগুলি এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

শ্যামাপ্রসাদজী ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে নেহরু কথায় কথায় সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া তলতেন। ডঃ মুখার্জী মনে করতেন দেশে একটি দলই আছে যে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রেখেছে বা উস্কানি দিয়ে গেছে। তিনি বলতেন, When I scan the whole course of Indian History, I do no find a single man who has done more harm to this country than Pandit Nehru. তারপর ১৯৫২ সালে যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে তিনি ও তাঁর দল অংশগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণ কলিকাতা থেকে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তিনি অন্যান্য জাতীয় দলের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে বিরোধী ব্লকের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি বিরোধী দলের অঘোষিত নেতা বলে বিবেচিত হন। বিরোধী নেতা হিসাবে তিনি সংসদের ভিতরে ও বাইরে পাকিস্তান সম্পর্কে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। এছাড়া তিনি ইউনিয়ন সিভিল কোড চালু করা, গো হত্যা বন্ধ, কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা করেন। এছাড়া তিনি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু করা এবং সেখ আবদুল্লার তিন জাতির বিরোধিতা করেন। ঐ বছরই ৭ই এপ্রিল রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান জানান। তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদের পরিচালনায় ভারতের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ইহার পূর্বে কলিকাতা আর কোনও রাজনৈতিক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে দেখে নাই। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ দিবস উদযাপিত হইয়াছিল। অন্যান্য কমসূচীর মধ্যে ছিল নভেম্বর মাসে সাঁচিতে বৌদ্ধ স্মারক চিহ্নগুলির সংরক্ষণ উৎসবে যোগদান। দক্ষিণ-পূর্ণ এশিয়ায় ব্রহ্মদেশ, কাম্বেডিয়ার দেশ ভ্রমণ। কানপুরে ভারতীয় জন সঙ্ঘের সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং কটকে নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা পেল তখন প্রায় ৫৫০ টি দেশীয় রাজ্য ছিল এবং তাঁদের রাজা বা নবাব ছিল। তাঁরা ইংরাজের অধীনস্থ স্বাধীন ছিল। এখন ব্রিটীশ চলে গেলে তাঁদের কী হবে। ব্রিটীশ বললে তারা ইচ্ছা করলে স্বাধীন থাকতে পারে আবার ভারত বা পাকিস্তান যে কোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে দেশীয় রাজাদের ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করাল। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ঘোষণা করলেন তিনি স্বাধীনভাবেই থাকবেন কোনও দেশের সঙ্গে যুক্ত হবে না। কাশ্মীরের বিশেষত্ব হচ্ছে অধিকাংশ প্রজা মুসলমান কিন্তু রাজা হিন্দু। সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত বা পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছে রাজাদের সম্মতিতে জনগণের সম্মতিতে নয়। যখন প্যাটেলজী সমস্ত রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করাতে সমর্থ হল তখন পাকিস্তান জোর করে কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করল। মহারাজ হরিশ ২৬শে অক্টোবর ১৯৪৭ সালে ভারতে যুক্ত থাকার জন্য রাজী হলেন কিন্তু নানা রকম শর্ত ও যুক্তি খাড়া করতে লাগল। এদিকে রাজা হরি সিং ৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে চিঠি লিখে জানালেন ইতিমধ্যে মোঙ্গলা, আলিবেগ, গুরদ্বয়ারা, মিরপুর টাউন, ভীমপুর টাউন, রাজরী টাউন এবং ছাম্ব, নওশেরা, ঝানগড় এবং কোটলীর সন্নিহিত অঞ্চল পাকিস্তান দখল করে নিচ্ছে। ভারতীয় সেনা যেন অবিলম্বে ঐ শাসনকারী তথা পাকিস্তানীদের কাশ্মীর থেকে হটিয়ে দেয়। তখন ভারত সরকার সেনা পাঠিয়ে ঐ সমস্ত অঞ্চল দখলমুক্ত করার চেষ্টা করলেন এবং বহুলাংশে সফল হলেন। যখন হঠাৎ ভারত সরকার যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন কাশ্মীরের অনেকাংশ দখল না করে। সেই অংশগুলি আজও পাকিস্তানে অবস্থিত যাহা আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত। কাশ্মীরের মধ্যে তিনটি অংশ আছে তার মধ্যে কাশ্মীর সেখ আবদুল্লার ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের ভাল প্রাধান্য আছে কিন্তু জম্মু ও লাডাক অঞ্চলে সেরকম প্রাধান্য নেই বরং কংগ্রেসের ভাল প্রাধান্য আছে এবং জম্মু অঞ্চলে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য।

কাশ্মীর প্রদেশ স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলেও কয়েকটি বিশেষ আইন ওই রাজ্যে প্রযোজ্য ছিল এবং আগেই বলেছি রাজ্যের বেশ খানিকটা অঞ্চল পাকিস্তান দখল করে রেখেছে। কিন্তু অন্য দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। ওই রাজ্যে কোন ভারতীয় জমি কিনতে পারবে না। ওই রাজ্যে যেতে গেলে পারমিট লাগবে। ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত। ৩৭০ ধার আইন আছে ইত্যাদি...এদিকে ১৯৩৯ সালে সেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স পার্টি গঠিত হয়। উনি ১৯৪৬ সালে কাশ্মীর ছাড় আন্দোলন শুরু করেছিলেন রাজ্য হরি সিং-এর বিরুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে নয়। ফলে সেখ আবদুল্লাকে রাজা হরি সিং জেলে পাঠান তারপর ১৯৪৭ নেহরু পরামর্শে তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেন। সেখ আবদুল্লা ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তে লেখেন-অতীতে যাই ঘটুক না কেন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার প্রতি আমার আনুগত্য শ্রদ্ধা

যথাযথই আছে এবং আমি, বিশ্বাস করি আপনার নেতৃত্বেই কাশ্মীর শান্তি ও উন্নতি সম্ভব। পরে নেহরুজী শেখ আবদুল্লার সঙ্গে 'মাখামাখি' করে রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। যদিও ভারতভুক্তির ব্যাপারে রাজার কথাই শেষ কথা জনগণের মতামতের কোন মূল্য ছিল না ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭ এবং গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫ অনুসারে, তবুও ওই রাজ্যের মুসলিম জনগণ কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির ব্যাপারে কোনও প্রকার আপত্তি ছিল না। আগেই বলেছি জম্মুতে ও লাদাখে অমুসলমানদের আধিক্য ছিল এবং তারা সেখ আবদুল্লার পক্ষে ছিল না এমনকী রডোরী, পুঞ্চ ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাধিক্য অঞ্চলের মুসলিম জনগণ সেখের প্রতি আনুগত্য ছিল না।

এখন ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরের জন্য কিছু বিশেষ আইনের পরও জম্মুর প্রজা পরিষদ আন্দোলনের ফলে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কাশ্মীর সরকারের নানা নির্যাতন ইত্যাদির সংবাদ দিল্লীতে আসে। এই নিয়ে শ্যামাপ্রসাদজীর সঙ্গে সেখ আবদুল্লা ও নেহরুর চিঠির আদান প্রদান হয় এবং তাতে উভয়পক্ষের মধ্যে মতান্তর হয়। দিল্লীর চাঁদনী চকে শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং হেবিয়াস কর্পাস আবেদনে মুক্তি লাভ করেন। তারপর শ্যামাপ্রসাদজী ৮-৫-১৯৫৩ সালে সেখ আবদুল্লাকে টেলিগ্রাম করে জানালেন তিনি কাশ্মীর নিয়ে পরিস্থিতি দেখার এবং সম্ভব হলে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রওনা হয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। পণ্ডিতজীকেও তিনি ইহার কপি পাঠান তারপর ৯ই মে যাত্রা শুরু করার পর শেখ আবদুল্লার উত্তর পান এবং তিনি কাশ্মীরে আসতে নিষেধ করেন নি শুধু বলেছিলেন আপনার আসাটা সময়োপযোগী বা কার্যকরী হবে না এবং নেহরুজী এ ব্যাপারে কোনও মতামত জানান নি। তা সত্ত্বেও তিনি রওনা হলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে ভারত সরকার হয়ত পারমিট প্রথা না দেওয়ার কাশ্মীরে ঢুকতে দেবে না। এই জন্য সবাই ভেবেছিলেন যে পারমিট প্রথা না মানায় শ্যামাপ্রসাদজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। ভারত সরকারের আইন অমান্য করলে ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী বিচার হবে। কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাশ্মীর সরকারের হাতে, তাঁকে কাশ্মীর সরকারের Public Security Act অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেখানে পারমিট প্রথা অমান্য করার কোন প্রকার উল্লেখই ছিল না। এবং তাঁকে কাশ্মীর প্রবেশে অযাচিত সাহায্য করা হয়েছিল। তাঁর সহযাত্রী গুরুদত্ত বৈদ্যের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় ১১ মে তিনি পাঠানকোটে পৌঁছান। তারপর কাশ্মীর রওনা হলে গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানান নির্দেশ আছে 'পারমিট' না থাকলেও তাঁকে কাশ্মীরে যেতে দেওয়া হবে। এজন্য তিনি যানবাহনের ব্যবস্থা করে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে মাধেপুর চেকপোষ্ট পর্যন্ত গেলেন। তারপরে সকলে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। এখানে উল্লেখ্য প্রত্যেক জায়গাতেই শ্যামাপ্রসাদজীকে হাজার হাজার মানুষ অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন এবং তিনি তাঁদের

অভ্যর্থনা নিয়েই রাভি নদীর তীরে জম্মু কাশ্মীরের সীমানা মাধেপুর চেক পোস্টে পৌঁছান। তারপর রাভি নদীর সেতু পেরিয়ে ওই রাজ্যে প্রবেশ করলেন। নদী পেরোনার আগেই কাশ্মীরের চীফ সেক্রেটারী ও পুলিশের আই. জি তাঁকে আগে থেকে সই করিয়ে আনা দুটি অর্ডার দেখিয়ে গ্রেপ্তার করেন। প্রথম অর্ডারটির তারিখ ছিল ১০ই মে তাতে বলা হয়েছিল তিনি যেন কাশ্মীর প্রবেশ না করেন। ২য় অর্ডারটি ১১ মের তারিখের হলেও আগে থেকেই সই করিয়ে রাখা ছিল যাতে করে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা যায়। কেননা যে সময়ে ওই চিঠি বা অর্ডারগুলি সই করানো হয় তখন অর্ডারের বিষয়বস্তুর অস্তিত্বই ছিল না এবং স্বাক্ষরকারী অফিসারগণ ঐ সময় উপস্থিত ছিল না। সেই অর্ডারে লেখা ছিল জম্মু-কাশ্মীরের শান্তি ও নিরাপত্তার কারণে লিপ্ত এবং তাহা প্রতিরোধেই শ্যামাপ্রসাদজীকে গ্রেপ্তার করা হল। এবং ওই অর্ডারে আরও লেখা ছিল তাঁকে যেন শ্রীনগরের সেন্ট্রাল কারাগারে দু-মাস বন্দী করে রাখা হয়। এইভাবেই নেহরু তথা ভারত সরকারের চক্রান্তে কাশ্মীর সরকারের হাতে শ্যামাপ্রসাদজী বন্দী হলেন। শ্যামাপ্রসাদকে বন্দী করার পর সেখ আবদুল্লা বেতার ভাষণ দেন এবং বলেন পারমিট আইন অমান্য করে কাশ্মীর প্রবেশের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তারের পর কাশ্মীর সরকার অর্ডিনান্স জারী করে 'পারমিট' আইন করেন। সুতরাং কাশ্মীরের প্রবেশের সময় কাশ্মীর সরকারের কোন পারমিটের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এই ব্যাপারে সেখ আবদুল্লা অসত্য কথা বলেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের পারমিট অনুযায়ী তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল না কেন বরং তাঁকে কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য অযাচিত সাহায্য করা হল কেন? কারণটা আর কিছুই নয় কাশ্মীর রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের আওতার বাইরে। ভারতের সরকারের আইনে গ্রেপ্তার করলে তাঁকে দিল্লীতে ফেরৎ পাঠাতে হয় বিচারের জন্য। কেননা কয়েকদিন আগে শ্যামাপ্রসাদকে দিল্লী গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আদেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাছাড়া নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে একটা মামলা চলছিল। সুতরাং সেই বিচারের সময় তার উপস্থিতির জন্য দিল্লীতে থাকা দরকার ছিল। সুতরাং তিনি অবঞ্ছিত মনে করলে কাশ্মীর সরকারের তাঁকে বার করে দেওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ দিল। কিন্তু তা না করে তাঁকে দু মাস বন্দী করে রাখার অর্ডার দেওয়া হল কেন? তাছাড়া দিল্লীর বিচারক কাশ্মীরের চীফ সেক্রেটারীকে জানান ফৌজদারী মামলার জবাববন্দী গ্রহণ করার জন্য শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতির প্রয়োজন। সুতরাং তাঁকে যেন অতি শীঘ্র ছেড়ে দেওয়া হয়। কাশ্মীর সরকার এ ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগলেন এবং শেষে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন যে তাঁকে ১৩ই জুলাই-এর আগে অর্থাৎ দু মাস বন্দী করে রাখা হয়েছে। আসলে নেহরু দু মাস ইংল্যান্ডের রানীর রাজ্য অভিষেকে ইংল্যান্ডে যাবেন এবং দু'মাস বাদে ফিরবেন। নেহরু ফিরলেই তাঁকে ফেরত পাঠানো হবে। শেখ আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরবর্তী বিবৃতিতে একথা স্বীকার করে বলেছিলেন নেহরু ফিরলেই তাঁকে ভারতে ফেরৎ পাঠানো হত। নেহরুও

লন্ডন থেকে ফিরে এসে এই কথাই বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন এক শোকবহ দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে আর এক প্রকারে মুক্তি পেলেন। শ্যামাপ্রসাদজীও তাঁকে গ্রেপ্তারের পর জানিয়ে দিলেন যেভাবে ভারত সরকার তাঁর কাশ্মীর ঢোকার পথ সুগম করেন এবং কাশ্মীর সরকার নিরাপত্তার কারণে গ্রেপ্তার করেন তা হতে ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে এক ষড়যন্ত্রের কথা প্রমাণিত হয়।

শ্যামাপ্রসাদ ১১ই মে বন্দী হওয়ার পর প্রায় চল্লিশ দিন বন্দী অবস্থায় থাকেন অবশেষে ২৩শে জুন শহীদ হন। তাঁকে কোথায় কীভাবে রাখা হয়েছিল তাঁর সহবন্দী গুরুদত্ত বৈদের বিবরণ থেকে কিছুটা উল্লেখ করছি—

তাঁকে যে কুটীরে রাখা হয় আয়তনে ক্ষুদ্র অপরিসর। প্রধান কামরাটি ১০ × ১২ ফুট। তাঁরা তিন জন বন্দী ছিলেন চার জন থাকার মত জায়গা ছিল না। পাশের ছোট দুটি কামরায় সহ বন্দীদের রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ১৯ শে জুন যখন পণ্ডিত ডোগরা এলেন তখন তাঁর বাইরে একটি তাঁবু খাটিয়ে রাখা হয়। কুটীর সংলগ্ন প্রাঙ্গণটি ফলের গাছ ও তরকারীর ক্ষেত ছিল, বেড়ানোর মত জায়গা ছিল না। এর ফলে তাঁর খাবার প্রতি অনীহা এসে গিয়েছিল যদিও তিনি বেড়ানোর অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। জায়গাটি ছিল শহর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে। এখানে চিকিৎসার কোনও প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। প্রয়োজন পড়লে শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে হত। তাঁর জন্য কোনও টেলিফোনেরও ব্যবস্থা ছিল না। নিকটবর্তী টেলিফোন ছিল জল সরবরাহ অফিসের বাড়ীতে। ওখানে থেকে দূরে এবং কম্পাউন্ডের বাইরে থাকায় ফোনটি ব্যবহার করা যেত না। তা ছাড়া অফিসের সময় ছাড়া টেলিফোন ঘর বন্ধ থাকত। হিন্দুস্থান টাইমস এবং পরে হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ডও পত্রিকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পত্রিকাগুলি নিয়ে আসতেন। শ্রীনগর থেকে আসা চিঠিপত্র পেতেও প্রায় এক সপ্তাহ লেগে যেত।

জেলে থাকার সময় তাঁকে বন্ধ বা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁর পুত্র শ্রীনগরে বাবার সঙ্গে দেখা করা অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু দিল্লীর সরকার তাঁকে শ্রীনগরে বাবার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়নি। ২৪ শে মে নেহরু শ্রীনগরে বিশ্রামের জন্য বেড়াতে যান। ভদ্রতার খাতিরে তিনি কেমন আছেন বা অন্যান্য খরব নেওয়ার মত সামান্যতম সৌজন্যটুকু তিনি দেখাননি, ফিরে এসে তিনি দুমাসের জন্য লন্ডনে ছুটি কাটাতে গেলেন।

৩ রা জুন থেকে তাঁর পায়ের ব্যথা শুরু হয় ৬ তারিখ থেকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন। জ্বর শুরু হয়। তাঁর আত্মীয়রা ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অসুস্থতার কথা জানান এবং তাঁকে কাশ্মীরের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান। তারপর থেকে তাঁর ওজন কমে যাচ্ছিল তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে ছিলেন। ২০ তারিখে ডাঃ আলি মহম্মদ ও অমরনাথ রায়না তাঁকে পরীক্ষা করেন এবং চিকিৎসা করে বলেন ড্রাই প্লুরিসির জন্য তাঁর

কষ্ট হচ্ছে। এজন্য তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে Streptomycen ইনজেকসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, কেননা ঐ ইনজেকসন তাঁর শরীরের পক্ষে সহ্য হবে না একথা পারিবারিক চিকিৎসক জানিয়েছিলেন। ২১ শে জুন তাঁর জ্বর ও বুকের ব্যথা বাড়ে, কিন্তু ডাঃ আলি তাঁকে দেখতে আসার প্রয়োজন মনে করেনি। ২০ শে জুন শ্যামাপ্রসাদজী তাঁর অসুখের খবর বাড়ীতে জানানোর জন্য সুপারিনটেন্ডেন্টকে বলেন কিন্তু সে সংবাদ জানানো হয়নি বা কোন প্রকার বুলেটিনও প্রচার করেন নি। ২২তারিখে অসুস্থতার জন্য তাঁকে নার্সিং হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ২০ শে জুন তাঁর রোগ প্লুরিসি বলে নির্ণয় করা হলেও তাঁকে ২০ থেকে ২২শে জুন পর্যন্ত নার্সিংহোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। রোগের এমন অবস্থা সত্ত্বেও তাঁর কোনও প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়নি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দুই সহ বন্দীকে তাঁদের অনুরোধ সত্ত্বেও সঙ্গে বাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁকে কোনও নার্সিংহোমেও ভর্তি করা হয়নি সরকারী হাসপাতালে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেই সময়ও তাঁকে পুলিস প্রহরায় কয়েদীর মত বন্দী করে রাখা হয়। ২৩ তারিখে ভোর পৌনে চারটার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি চাইলেও তাঁর সহবন্দীদের মৃত্যু শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় নি। এদিকে ২৩ শে জুন সকাল পৌনে ছটায় শ্যামাপ্রসাদজীর ৭৭ নং বাড়ীতে টেলিফোন বাজে। দাদা জাষ্টিস রমাপ্রসাদ মুখার্জী টেলিফোন ধরেন। অপর প্রান্ত থেকে অপারেটর সংবাদ জানান যাহা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এসেছিল। বৃদ্ধা মা যোগমায়া দেবী তখন পূজা করছেন। বাড়ীর সকলে তখন টেলিফোনের কাছে জড়ো হয়েছে। অপারেটর জানান- Sree Nagar Tells me that there is message form Sheikh Abdulla to you and the message is that Dr Shyamprosad is dead and Sheekh Abdulla wants to know what about the disposal of the body" খবরটা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যান। জাষ্টিস মুখার্জী যখন বিস্তারিত খবর জানতে চাইছেন তখন অপারেটর জানান 'শ্রীনগর বলছে যে তিন দিন আগে ডঃ মুখার্জীর প্লুরিসি রোগ হয় এবং গতকাল তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে তিনি ৩.৪০ মি নাগাদ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। তখন মি. মুখার্জী খবরটা সত্যতা জানতে চান তখন দিল্লীর অপারেটর আবার শ্রীনগরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানান কাশ্মীরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ধর টেলিফোনে জানিয়েছেন। জাস্টিস মুখার্জী জানান যে বডি অবশ্যই কলকাতায় পাঠাতে হবে। তখন অপারেটর জানান কাশ্মীর সরকার আবার আধঘন্টা বাদে টেলিফোন করবেন বলে জানিয়েছেন। এইভাবেই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর খবর তাঁর জননীও পরিবার বর্গকে জানানো হয়।

নেহরুজী ফিরে এসে জানান যে টেলিফোনে যোগাযোগের কারণেই এরূপ ভাবে সংবাদ বাড়ীতে জানান হয়। আসলে ভারত সরকার কাশ্মীর গভর্ণমেন্টের কাছে Flash messege এ এই খবর পান। তখন হোম সেক্রেটারী মি. পাই কাশ্মীর সরকারকে নির্দেশ

দেন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য যেন ডাঃ মুখার্জীর পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আসলে কাশ্মীর সরকার প্রথমে ভারত সরকারকে মৃত্যু সংবাদ জানান এবং ভারত সরকারের নির্দেশেই শ্যামাপ্রসাদজীর বাড়ীতে খবর দেন। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সময় নষ্ট না করে কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদজীর বাড়ীতে সরাসরি জানাবার প্রয়োজন মনে করেন নি। সুতরাং টেলিফোনে যোগাযোগের বাধা-বিঘ্নের কাহিনী ধোপে টেকে না।

মৃত শ্যামাপ্রসাদকে নিয়েও ষড়যন্ত্র শুরু হল। ৮টা নাগাদ শবদেহ বার করা হল। শ্যামাপ্রসাদজী বন্দী অবস্থায় বই পড়ে, ডায়েরী লিখে ও অন্যান্য কিছু লেখা নিয়ে সময় কাটাতেন। হাসপাতালে যাবার সময় সেই ডায়েরী ও কাগজগুলি নিয়ে যান। তাঁর ব্যবহৃত হাতঘড়ি, কলম, সুটকেস পাওয়া গিয়েছে কিন্তু সঙ্গের অ্যাটাচি কেসটা ছিল না। সুটকেসে কোনও তালা বা চাবি ছিল না। সেই লেখা বা ডায়েরী পাওয়া যায়নি। কাশ্মীর সরকারকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েও সেগুলি ফিরে পাওয়া যায়নি এবং তাঁরা এসব রেখে দিয়েছেন বলে অস্বীকার করেছিলেন। স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে কাশ্মীর সরকার ডায়েরী বা কাগজপত্র চেপে রেখেছেন কেননা তাহলে বন্দী জীবনের অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যেত।

৮.৪০ মি. নাগাদ শবদেহ বিমানবন্দরের দিকে রওনা হয়। ৯.০৫ নাগাদ বিমানবন্দরে পৌঁছায়। সেখানে সেখ আবদুল্লা ছাড়া সকল মন্ত্রীই উপস্থিত ছিলেন। ১০-১৫ মি নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী এলেন। ১০-৩০ মি নাগাদ প্লেন রওনা দেয় এবং বেলা ৩টা নাগাদ দমদমে পৌঁছাবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু সেই বিমান পৌঁছাল রাত্রি ৯ টায়। কৌসুলী শ্রীত্রিবেদী ওই শবদেহের সঙ্গে আসছিলেন। তিনি অত্যধিক বিলম্বের কয়েকটি কারণের উল্লেখ করেছিলেন। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শবদেহ যেন রাত্রের আগে কলিকাতায় না পৌঁছায়। সবাই আশা করেছিল দিল্লী হয়ে বিমান কলিকাতা বিমান বন্দরে নামবে। মৃতদেহবাহী বিমান সারাদিন ধরে আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করেছে যাতে করে প্লেন দিনের বেলায় কলকাতায় না নামে।

সমগ্র ভারতবাসী শোকে মুহ্যমান। জম্মুতে পুলিশ রাস্তায় নেমেছে। দিল্লীতে লাখ লাখ মানুষের মিছিল। শোকস্তব্ধ পাঞ্জাব বিমানবন্দর দখল করে নিয়েছে। অজস্র মানুষের ঢল কলকাতার রাজপথে। শালিমার রেল ইয়ার্ডের শ্রমিকরা বেতন প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছেন মহামিছিলে যোগদিতে। মানুষ এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না খবরের সত্যতাকে। সবাই আশা করছে যেন খবরটা ভুল হয়। তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়ে মৃত্যু সংবাদ সঠিক বলে প্রমাণিত হল। তখন রাস্তায় কাতারে কাতারে লোকের মিছিল। অজস্র মানুষ চলেছে বিমানবন্দরের পথে। মানুষ চলেছে প্রিয় নেতাকে শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানাতে। অফিস, আদালত, কাজকর্ম বন্ধ করে মানুষ চলেছে মহা মিছিলে যোগ দিতে। কলকাতা কিভাবে উত্তাল হয়েছিল ওই সময়কার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময়কার কোনও ব্যক্তি জীবিত থাকলে তার কাছ থেকে কিছুটা তথ্য জানতে পারবেন। রাত্রি প্রায়

৯টার সময় শবদেহ বহনকারী বিমান দমদমে নামে। ঐ সময়ও জনতার ভীড় এতছিল যে প্রবেশ পথে পুলিশ বেষ্টনী করে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়। রাত্রি দশটার সময় দমদম থেকে বিরাট শোভা যাত্রা সহ ডঃ মুখার্জীর শবদেহ রওনা হয়। যতই এগোতে থাকে ততই কাতারে কাতারে লোকে মিছিলে যোগদান করে এত রাত্রেও। শ্যামবাজার মোড়েই লক্ষাধিক নরনারী গভীর রাত পর্যন্ত ডঃ মুখার্জীকে শেষ দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তাঁদের এই বাঁধভাঙ্গা হাহাকারই বলে দেয় মানুষের মনে তিনি কত গভীরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। নেতাজী ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ে এতটা স্থান করে নিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তারপরে যখন শ্যামাপ্রসাদজীকে নিয়ে সমগ্র বাংলা উত্তাল কংগ্রেস সরকার তথা নেহরুকে লোকে গালাগালি দিচ্ছে এবং নানারকম পত্র চালাচালি হচ্ছে তখন লোকের মন ও ব্যথাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সরকার ট্রাম ও বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দিল এবং তাই নিয়ে বামপন্থীরা আন্দোলন শুরু করে দিল, ট্রাম বাস পোড়ান শুরু করে দিল। লোক আস্তে আস্তে শ্যামাপ্রসাদজীকে ভুলে গেল।

তারপর থেকে আজও বিভিন্নভাবে শ্যামাপ্রসাদজীকে সরকার ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বা করছে এবং শ্যামাপ্রসাদজীর অবদান লোকে ভুলতে বসেছে। এই প্রচারে সরকার বহুলাংশে সফল। এই প্রচারের ফলে জনমানসে ধারণা শ্যামাপ্রসাদ একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। এযুগের লোকেরা বিশেষ করে আধুনিক প্রজন্ম তাঁর নামই জানে না। ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর আগে আমার এক শিক্ষিত, ব্যাঙ্ক কর্মচারী আত্মীয়কে শ্যামাপ্রসাদজীর ফটো দেখিয়ে বলেছিলাম 'ফটোটা চিনিস, এটা কার ফটো'। সে কিন্তু বলতে পারল না। শুধু কংগ্রেসীরা কেন বামপন্থী তথা সেকুলার পন্থী সকল দল শ্যামাপ্রসাদের নাম উচ্চারণ করে না পাছে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট হয়, মুসলমান ভোট না পায়। তাই বলছিলাম আজকের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জনগণ বিশেষ করে যুব সমাজ যদি তাঁকে স্মরণ না করে মহাপাপের ভাগীদার হবে।

সাম্প্রদায়িক শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য

যখন শ্যামাপ্রসাদজী যখন ভারত তথা বঙ্গ বিভাগে সায় দিয়াছিলেন তখন বহু বুদ্ধিজীবি, ঐতিহাসিক, গুণীজন বাংলা বিভাগের পক্ষে সায় দিয়াছিলেন। কাশ্মীরের হুরিয়ত নেতা আলি শাহ গিলানি ও স্বীকার করে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদজী দেশ বিভাগের পক্ষে ছিলেন না। এমন কী বাংলাদেশের লেখক শাহরিয়র কবির মত প্রকাশ করেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরাই পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন এবং প্রকৃত অবস্থা বিচারে বাংলা বিভাগে না হলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নিরাপত্তা সব দিক দিয়ে হিন্দুগণ বিপন্ন হয়ে পড়তেন এবং তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হত সংখ্যালঘু হিন্দুদের কথা বিবেচনা করে তিনি বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভাজন করে হিন্দু, শিখেদের মন প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন এবং তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আজকের হাভার্ডের অধ্যাপক কিন্তু শ্যামাপ্রসাদজীকে বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তা ও সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের একটি পত্র

মধুপর, ১৭.৭.৪২

শ্রীচরণেষু,

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief ও Relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমার মৃত্যু হ'ত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবলিওয়ালাদের ঋণই বেশী। হক্ সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে, "আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না", আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুণদলের লীডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর Assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক্ সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। "নবযুগের" সম্পাদনার ভার যখন নিই, তার কিছুদিন আগে ফিল্মের Music-direction-এর জন্য সাত হাজার টাকার কনট্রক্ট্ পাই। হক্ সাহেব ও তাঁর অনেক হিন্দু-মুসলমান Supporters আমায় বলেন যে তাঁরা ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি Film-এর Contract cancel করে দিই। পরে যখন দু'তিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক্ সাহেবকে বললাম "আপনি কোন ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে আমায় ঋণ করে দিন, আমার মাইনের অর্দ্ধেক প্রতি মাসে কেটে রাখবেন।" হক সাহেব খুশী হয়ে বললেন,

"পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব"। তারপর সাতমাস কেটে গেল, আজ নয় কাল করে। তাঁর Supporter-রাও উদাসীন হয়ে রইলেন। হিন্দু-মুসলিম ইউনিটির এক লাখ টাকা যখন মঞ্জুর হল, টাকা যখন হক্ সাহেব পেলেন, তখনো তিনি উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি জানেন, Secretariat-এ আপনার সামনে হক্ সাহেব বললেন, "কাজীর ঋণ শোধ করে দিতে হবে।" আপনিও আমাকে বললেন, "ও হয়ে যাবে"। আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করব বললাম। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান Unity-র জন্য আমি আমার কবিতায়, গানে গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে লেখা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে-সে গান বাঙলার হাটে-ঘাটে, পল্লীতে, নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি। যদি হক্ মন্ত্রীত্ব ভেঙ্গে যায়, তা হবে আবার Coalition ministry-র জন্য। হক্ সাহেব একদিন বললেন, "কিসের টাকা?" আমি চুপ করে চলে এলাম। এরপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি Secretariat-এ যখন বলেছিলেন, "ও হয়ে যাবে" তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম "আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।" এই Coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি আর কাউকে নয়। আমি জানি-আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে-আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি Hindu muslim unity Fund থেকে আমার ঋণমুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশ' টাকা পেয়েছি। আরো পাঁচশ' টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন, পাঠিয়ে দেবেন বা যখন মধুপুরে আসবেন, নিয়ে আসবেন, কোর্টের ডিক্রির টাকা দিতে হবে। তিনি চার মাস দিতে পারিনি। তারা হয়ত Body Wareant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভিকতা, শৌর্য্য, সাহস-আমার অণুপরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল।

আমার আনন্দিত প্রণাম-পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন।

প্রণত

কাজী নজরুল ইসলাম

কি ব্যবস্থা করা যাবে যে বিষয়ে জুলফিকর হাইদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। নজরুল সুস্থ হয়ে ফেরত আসে।

-শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়